বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রকাশনা ও অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ■ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) ■ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' উপলক্ষ্যে আমি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে ৭ মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে যে কালজয়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির মুক্তির ডাক।

স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এ সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি জনগণকে প্রত্যেক গ্রাম ও মহল্লা পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে এবং তাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানান। ভাষণের শুরুর দিকেই তিনি বাংলায় পাকিস্তানের ২৩ বছরের দুঃশাসনের ইতিহাসকে এদেশের মানুষের রক্তে রঞ্জিত করার ইতিহাস হিসেবে উল্লেখ করেন। স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে কোটি বাঙালিকে উজ্জীবিত করতে তিনি বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।" ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তিকামী জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে এ ভাষণ ছিল এক মহামন্ত্র। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর এ ভাষণকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড়ো অর্জন। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে "Poet of Politics" হিসেবে অভিহিত করে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। মহান এ নেতার সে স্বপ্ন পূরণে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে শহিদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে রচনা করেছিলেন ১৮ মিনিটের এক মহাকাব্য। গত বছর আমরা এই মহাভাষণের সুবর্ণজয়ন্তী এবং আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি। এ বছর আমরা ভাষা-আন্দোলনের ৭০ বছর এবং মুজিববর্ষ উদযাপন করছি। এমনই এক মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধায় প্রথমেই স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ, দু'লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং অগণিত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে- যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশ সমার্থক শব্দ। পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে তাঁদের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির পিতা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছর লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। একমাত্র তিনিই ছিলেন হাজার বছরের শোষিত-বঞ্চিত বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ '৭০-এর নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু, পাকিস্তানিরা আওয়ামী লীগের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ না করে নানা টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে তিনি আমাদের 'স্বাধীনতা' নামের এক অমরবাণী শুনান এবং সংগ্রামের মাধ্যমে শৃঙ্খলমুক্তির পথ দেখান। শুধু তাই নয়, তিনি বীর বাঙালিদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে উত্তীর্ণ করেন ভাষণের শেষ দু'টি শব্দে- 'জয় বাংলা' স্লোগানে। রাজনীতির কালজয়ী কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই ভাষণের মাধ্যমে দেশের শাসনভার জনগণের হাতেই তুলে দেন, ক্ষমতাকে কি করে নিয়ন্ত্রিতভাবে সকলের কল্যাণে ব্যবহার করতে হয় তাও বুঝিয়ে দেন, শিখিয়ে দেন আত্মরক্ষামূলক কিংবা প্রতিরোধক সমরনীতি, যুদ্ধকালীন সরকার ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি। সেই মর্মস্পর্শী বজ্রনিনাদ ৭ কোটি বাঙালির হৃদয়কে বিদ্যুৎ গতিতে আবিষ্ট করেছিল; একটি ব্রিটিশ পত্রিকা বঙ্গবন্ধু ভবনকে ১০-ডাউনিং স্ট্রিটের সঙ্গে তুলনা করেছিল, এমনকি ঢাকায় রাষ্ট্রপতির বাসভবনে বাঙালি বাবুর্চি ইয়াহিয়া খানের জন্য রান্না বন্ধ করে দিয়েছিল। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি মানুষ ইয়াহিয়ার শাসনকে অগ্রাহ্য করে শেখ মুজিবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সেই রাতে পাকিস্তানি শাসক তাঁকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার দামাল ছেলেরা নয় মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের বাংলার মাটিতে পরাস্ত করে ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনে। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে একটি উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেন। দুর্ভাগ্য, '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে '৭১-এর পরাজিত শত্রুদের এদেশীয় দোসররা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। মুজিব বিহীন বাংলাদেশ কাণ্ডারিহীন নৌকার মতো হত্যা-কু-ষড়যন্ত্রের দোলাচলে দীর্ঘ ২১টি বছর ভাসতে থাকে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর খুনি মোস্তাক-জিয়ার আনীত দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল করে এবং জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু করে। পরবর্তীতে আমরা ২০০৯ সাল থেকে পরপর তিন দফা সরকার গঠন করে জাতির পিতার আদর্শে দেশের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করি। জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করি; ফলে জাতি গ্লানিমুক্ত হয়। আমরা সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রণয়ন করে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদের পঞ্চম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করি। ২০১৩ সালে Jacob F. Field প্রকাশিত ২৫০০ বছরের বিশ্বসেরা যুদ্ধকালীন ভাষণের সংকলন 'We Shall Fight on the Beaches: The Speeches That Inspired History'-এ এই ভাষণ অন্যতম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘের ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এ ভাষণকে বিশ্ব-ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। শুধু তাই নয়, ইউনেস্কো মনে করে এ ভাষণটির মাধ্যমে জাতির পিতা প্রকারান্তরেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্বস্বীকৃতি আজ বাঙালি জাতির জন্য এক বিরল সম্মান ও গৌরবের স্মারক। '৭৫ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত এদেশে এই ভাষণ প্রচার নিষিদ্ধ ছিল, যেমনটা করেছিল পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী- তারাও সেদিন রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে এ ভাষণ প্রচার করতে দেয়নি। কিন্তু সত্য সর্বদাই অনিরুদ্ধ। তাই, নিপীড়িত-নির্যাতিত বাঙালিদের মুক্তির এই মহামন্ত্র শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হচ্ছে, অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সরকারের গৃহীত উদ্যোগের ফলে বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমি সকলকে জাতির পিতার মহান আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আর দাবায়ে রাখতে পারবা না

জাফর ওয়াজেদ

উদার আকাশ আর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে লাখো লাখো মানুষের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে ডাক দিয়েছিলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রণাঙ্গনে শত্রুর হাত থেকে স্বদেশ উদ্ধারে। একটি ডাকে জেগেছিল সাত কোটি প্রাণ রণাঙ্গনে স্বাধীনতার সোনার স্বপন এনেছিল রক্তদানে। বাঙালির জীবনে নয়া উন্মোচনের বার্তা হয়ে এসেছিল একাত্তরের সাতই মার্চ। আর তারই পথ ধরে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে এনেছিল স্বাধীন স্বদেশ। সামগ্রিকভাবে ৭ মার্চের ভাষণের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ভাষণের শব্দে সামান্য একটু ওদিক হলেও অর্থ একটাই–স্বাধীনতা। স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই ভাষণ বাঙালি জাতিকে নতুন করে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। বাঙালির মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন উদ্দীপনা। ইতিহাস জানান দেয় সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে চিরকালই। জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলেও এই ভাষণ একটি 'ইনস্টিটিউশন' হিসেবে বেঁচে থাকবে। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– এটা শুধু কোনো উদ্দীপ্ত ভাষণ নয়, বরং আরও বেশি কিছু।

একান্ন বছর আগে একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দেন, তা বাঙালির প্রতীক। জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রতীক আর সেই প্রতীক হিসেবে যুগ-যুগান্তর ধরে উজ্জীবিত রাখবে বাংলার মানুষকে শুধু নয়, বিশ্ববাসীকেও। এই ভাষণ আজ আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে ভাষণ বিশ্বের ৫০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যে ভাষণ শুনে এখনো আবেগতাড়িত হয় বাংলার নয়া প্রজন্ম, যে ভাষণ সংগত কারণেই ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। একটি রাজনৈতিক ভাষণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা এই ভাষণ নিয়ে গবেষণা, আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকেই বোঝা যায়। গবেষকরা বলেছেনও এ ভাষণটির গুরুত্ব বহুমাত্রিক, নিরন্তর, স্বাধীনতার ইতিহাস নির্মাণে সম্পূর্ণরূপে সফল। ইতিহাসবেত্তাদের মতে, ৭ মার্চের ভাষণ একটি দেশের স্বাধীনতার আগাম ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও দিকনির্দেশনা হয়ে উঠেছিল। ফলে ভাষণটি হয়ে উঠল মহান মুক্তিযুদ্ধের নিকটবর্তী অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণ শেষ পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি অকাট্য ও শ্রেষ্ঠ দলিলে পরিণত হয়। যা শুধু একাত্তর সালেই মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি যুগ যুগ এদেশের মানুষকে শুধু নয়, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষকেও স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত করবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহস, দেশপ্রেম, নেতৃত্বের দৃঢ়তা এবং কণ্ঠের আকর্ষণ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ভাষণটি এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস নির্মাণে একাত্তরেই শুধু নয়, অনন্তকাল ধরে জাতিগঠন, ইতিহাস নির্মাণ ও পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেই চলবে। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে প্রোৎসাহিত করেছিল, তা বিশ্ব ইতিহাসে আজও বিরল ঘটনা। যে ভাষণ বাঙালি জাতিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল, তা বিশ্বে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। আর এই ভাষণ সারা বাংলার সব মানুষকে পথপ্রদর্শন করেছিল শত্রুর সঙ্গে অদম্য লড়াইয়ের। দেখিয়েছিল কোন পথে এগোতে হবে, কেমন করে। তারও নির্দেশনা ছিল বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক নির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে। যে ভাষণ পৃথিবীর অর্ধশত ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সে ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতখানি, তা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার পুরো রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী ভাষণটি দেন ৭ মার্চ। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ না করেই তিনি পরিষ্কার বা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যে, স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিবেদনের জন্য বাঙালিদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ফলে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভের পথ বা অন্তত পক্ষে আইনগত দিক থেকে না হলেও সারবত্তার দিক থেকে এক ধরনের স্বাধীনতা অর্জনের পথ খোলা থাকল। ইতিহাস স্পষ্ট করে যে, ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ যেদিন পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শাসক ইয়াহিয়া খান গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে, সেদিনই মূলত বাঙালির ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। সেদিনই বাঙালিরা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। আর এই পহেলা মার্চ থেকে ধারাবাহিক সংগ্রাম এবং অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণভার দৃশ্যত চলে আসে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের হাতে। বীরের জাতি বাঙালি এবং তাকে পাকিস্তানের তেইশ বছর পরও পর্যুদস্ত করে রাখা যাবে না– এই উত্তাল মার্চেও সেই সময়ে প্রতিভাত হয়েছিল।

সাতই মার্চ এসেছিল বাঙালির জীবনে তার জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের নয়া উন্মোচনের বার্তা নিয়ে। যার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত বাঙালি জাতি চেয়েছিল তাদের ভোটে নির্বাচিতরা সরকার গঠন করবে, শাসনতন্ত্র তৈরির জন্য সংসদ অধিবেশনে মিলিত হবে। জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করার কাজটি পহেলা মার্চ করা হয়। বাঙালিকে যেদিন অপমান করা হয়েছিল। জাতীয় সংসদের পূর্বঘোষিত তেসরা মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় বাঙালি বুঝে নিয়েছিল– পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনসাধারণের প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্বাচনি রায়কে দলিত-মথিত করা হচ্ছে। ইয়াহিয়া খানের এক ঘোষণায় সারা বাংলা আগুনের ফুলকির মতো ঝলসে ওঠে। দাবানলের মতো আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়া বাঙালি ঘর ছেড়ে রাজপথে নেমে পড়ে। মিছিলে মিছিলে সয়লাব সারা বাংলা। মুক্তির পথপরিক্রমায় বাঙালি বুঝে নিয়েছিল আরও যে, তাদের নির্বাচনি বিজয়ের রায় ও স্বাধিকারের চেতনা নস্যাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর পাকিস্তানিরা। যুগ-যুগান্তরের শৃঙ্খল ভেঙে জেগে ওঠা বাঙালি এই অন্যায়-অপমান মাথা পেতে নেয়নি।

যুদ্ধটা শুরু হয়ে গিয়েছিল একাত্তরের তেসরা মার্চ থেকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন গর্জে ওঠা বাঙালির মুখোমুখি সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। তেসরা ও চৌঠা মার্চ চট্টগ্রামেই ১২০ জন নিহত ও ৩৩৫ জন আহত হন। প্রতিরোধের বহ্নিশিখা তখনই উথলে উঠেছে। ৪ মার্চ সেনাবাহিনীর গুলিতে খুলনায় ছয়জন নিহত ও ২২ জন আহত হন। ৫ মার্চ টঙ্গীতে পাকিস্তানিদের গুলিতে চারজন নিহত এবং ২৫ জন আহত হন। খুলনায় দুজন ও রাজশাহীতে একজন নিহত হন। ৬ মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল চলাকালে সেনাবাহিনী ও জনতার মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৩৪১ জন কারাবন্দি পলায়নকালে গুলিতে সাতজন নিহত ও ৩০ জন আহত হন। সম্মুখসমরের পূর্বাভাস এভাবেই পাওয়া যায়। আর এই শহিদদের হত্যার বিচারের দাবিতে তখন উৎকণ্ঠিত শেখ মুজিব। ৭ মার্চের ভাষণেও বলেছেন শহিদদের রক্ত মাড়িয়ে তিনি অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন না।

পহেলা মার্চ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর ঝলসে ওঠা বাংলাদেশের চারদিকে শুধু বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ। ২৩ বছরের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন সত্তার জাগরণ ঘটছে তখন দিকে দিকে।

দোসরা মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করা হয় এবং তাঁরই নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে স্বাধীন বাংলার মানচিত্রখচিত পতাকা উত্তোলিত হয়। তেসরা মার্চের পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে বঙ্গবন্ধু জানিয়েছিলেন যে, ছয় মার্চের মধ্যে যদি ইয়াহিয়া সরকার দাবি না মেনে নেয়, তবে ৭ মার্চ তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন। এই ঘোষণার আলোকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি উজ্জীবিত হয়ে উঠে স্বাধীনতার অভিলক্ষ্যে। আর পাকিস্তানি শাসক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও উদ্‌গ্রীব হয়েছিল যে, সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু কী ঘোষণা দেন। তারপরও পাকিস্তানি শাসকদের পক্ষে থেকে নমনীয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। কেবল ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া সংসদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করে। ইয়াহিয়ার এই ঘোষণা ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিতর্কিত বক্তব্য-বিবৃতিতে ফুঁসে উঠেছিল বাংলাদেশ অগ্নিঝরা মার্চের প্রথম দিন থেকেই।

একই সঙ্গে সেনানিবাসে সেনাসমাগম বৃদ্ধি এবং যুদ্ধংদেহী প্রবণতা এবং স্থানে স্থানে নিরস্ত্র বাঙালি হত্যার প্রবণতায় পরিস্থিতি হয়ে উঠে ক্রমশ বিস্ফোরোণ্মুখ। এরই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর পূর্বঘোষিত জনসভা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আর বিদ্রোহী বাংলা ক্রমশ দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। চৌঠা মার্চ রেডিও পাকিস্তান ঢাকার নাম থেকে পাকিস্তান শব্দ মুছে যায়। নয়া নামকরণ হয় ঢাকা বেতার কেন্দ্র। টেলিভিশনের নাম হয় ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র। এ দুই গণমাধ্যম থেকে প্রচারিত হতে থাকে স্বাধীনতার সপক্ষে গান, নাটকসহ জন-উদ্দীপনামূলক নানা অনুষ্ঠান। শেখ মুজিবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনে সচেষ্ট বাঙালি জাতি মুক্তি অর্জনের ইস্পাত কঠিন সপথের দৃঢ়তায় সশস্ত্র হয়ে ওঠার প্রেরণায় প্রশিক্ষিত হতে থাকে নানা স্থানে। অসহযোগ আন্দোলন বাঙালিকে প্রাণিত করেছে দুর্দমনীয় প্রতিরোধের বজ্রকঠিন সাহসে। গণসংগীত ভেসে আসতে থাকে সারা দেশ থেকে। প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের আগুন জ্বলতে থাকে বাঙালির মনে। অনেক রক্তদান করা বাঙালিকে তখন ডাকছে রণাঙ্গন। সাড়ে সাত কোটি প্রাণ এক হয়ে তখন শত্রুহননের জন্য প্রস্তুতি পর্বে নিমগ্ন ছিল। ৭ মার্চের ভাষণ কোনো আকস্মিক বিষয় ছিল না। এই ভাষণের আগে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু জাতিকে ক্রমশ স্বাধীনতার পক্ষে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের ষড়যন্ত্র এবং তা উপড়ে ফেলার জন্য করণীয়ও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি ভেতরে ভেতরে যে গভীর ষড়যন্ত্র চালু রেখেছে, তা আঁচ করতে পেরে একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণের পর শপথবাণী উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার শক্তি পৃথিবীতে কারও নেই। যারা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধিকারের দাবি বানচালের জন্য বাঙালিকে ভিখারি বানিয়ে ক্রীতদাস করে রাখছে, তাদের উদ্দেশ্য যে কোনো মূল্যে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।' সেদিন অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে এমনও বলেছিলেন, 'সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি হয়তো আপনাদের মাঝে না-ও থাকতে পারি। মানুষকে মরতেই হয়। জানি না আবার কবে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের এবং বাংলার মানুষকে ডেকে বলছি–চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন। বাংলার মানুষ যেন শোষিত না হয়। লাঞ্ছিত, অপমানিত না হয়।...বীর শহিদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফিরছে–বাঙালি তোমরা কাপুরুষ হইও না। চরম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও স্বাধিকার আদায় করো। বাংলার মানুষের প্রতি আহ্বান–প্রস্তুত হোন, স্বাধিকার আমরা আদায় করবই।' দৃঢ়তায় তিনি আবদ্ধ করার কাজটি সত্তরের নির্বাচনের পরই শুরু করেন। একাত্তরের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণসভায় উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শেখ মুজিব বলেন, 'এই প্রথমবারের মতো বাঙালি জাতি একতাবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের দাবিতে বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ।' বঙ্গবন্ধুর নির্ভরতা ছিল জনগণের ওপর। যে জনগণকে তিনি তিলে তিলে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেছেন। বলেছেনও একাত্তরের ২৯ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে, গত ২৩ বছর বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করা হয়েছে।

সেই পরিস্থিতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সনাতন ষড়যন্ত্র আজও চলছে। তবে ভরসা হচ্ছে, দেশবাসী আজ সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত এবং ষড়যন্ত্রজালকে ছিন্নভিন্ন করে কায়েমি স্বার্থবাদকে খতম করার ক্ষমতা দেশবাসী রাখে। ২৪ জানুয়ারি পূর্ববাংলার সংগীতশিল্পী-সমাজের সংবর্ধনার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'যদিও জনগণ প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছে; তবুও বিপদের আশঙ্কা এখনো দূরীভূত হয়নি। পথ এখনো কণ্টকাকীর্ণ এবং অনিশ্চিত।

...মনে রাখবেন, বিপদ আমাদের কাটে নাই। লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয় নাই। চরম সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেদিনের জন্য প্রস্তুত হোন।' এর আগে ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দীর্ঘ ভাষণে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন দিকনির্দেশনাসমেত গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথা। বলেছিলেন, 'দেশে যদি বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সে বিপ্লবের ডাক আমিই দেব।' এমনটাও বলেছিলেন, 'জনগণের স্বাধীনতার ফল ভোগ নিশ্চিত করার জন্য আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।' ৭ মার্চের আগের ভাষণ, বিবৃতি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়, ওইসব ভাষণের উপসংহার তিনি টেনেছিলেন ৭ মার্চের ভাষণে।

একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় লাঠিসোঁটা, তীর-ধনুক নিয়ে এসেছিলেন যারা স্বাধীনতার মন্ত্র বুকে বেঁধে, মহানায়কের ঘোষণা শোনার জন্য–তারা জানতেন, কঠিন লড়াই ছাড়া স্বাধীনতা আসবে না। জনসভার ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান প্রদক্ষিণ দেখে তাতে শত্রু সেনা আছে ভেবে কেউ কেউ লাঠি ছুড়ে মেরেছিল। মনোয়ারা বিবি একজন মহিলা গাইছিলেন–"মরি হায়রে হায়, দুঃখের সীমা নাই, সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরাণ ফাইডা যায়।'

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ কেন সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল বাহাত্তরের গোড়াতেই। ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন আপাতত পাকিস্তানিদের কাছ থেকে আসুক। প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন দূরদর্শী রাজনৈতিক বঙ্গবন্ধু তাই স্বাধীনতার কথা পরোক্ষভাবে বললেও সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। যদি করতেন তবে পাকিস্তানিরা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে পারত যে, শেখ মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদী। তিনি পাকিস্তানিদের এ সুযোগ দেননি। আর পাকিস্তানিরা তো বিমান, ট্যাংক নিয়ে প্রস্তুতই ছিল। যদি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। তবে লাখো লাখো লোকের সমাবেশে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত। ডেভিড ফ্রস্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন, '৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানেই কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন?' জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি জানতাম, কী ঘটতে যাচ্ছে। আমি জনসভায় ঘোষণা করি যে, স্বাধীনতা ও মুক্তির এটিই মোক্ষম সময়।' ফ্রস্ট আবার প্রশ্ন করেন, "সেদিন যদি আপনি বলতেন, 'আমি আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি', তাহলে কী হতো?" জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ওইদিনই সুনির্দিষ্টভাবে আমি তা বলতে চাইনি। কেননা তাতে তারা বিশ্বকে এ কথা বলার সুযোগ পেত যে, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, অতএব আক্রমণ করা ব্যতীত আমাদের উপায় ছিল না। আমি চেয়েছিলাম, আঘাতটা তাদের কাছ থেকে আসুক, আমার জনগণ সে আঘাত মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল।'

ইতিহাস বলে, বাংলাদেশ কার্যত স্বাধীন হয়েছে ৫ মার্চ। সেদিন বাংলাদেশের কর্তৃত্ব চলে আসে বঙ্গবন্ধুর হাতে, ওই তারিখের পর ইয়াহিয়া যা-ই করেছেন, বাংলাদেশের মানুষ সে কাজকে একটি সার্বভৌম দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসেবেই দেখেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল না কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ...৭ মার্চ সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসমাবেশে বলেছেন, 'বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম। ৭ মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে আমি ডাক দিয়েছিলাম– আর নয় মোকাবিলা করো। বাংলার মাটি থেকে দখলদারদের উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবা না।'

স্বাধীনতা ও মুক্তি শব্দ দুটি বঙ্গবন্ধুর খুব প্রিয় ছিল। তাই ৭ মার্চের ভাষণে তিনি মাঝখানে একবার বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

আবার শেষে সদর্পে বলেছেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' জাতি স্বাধীনতা পেয়েছে, চলছে মুক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রাম থেকে বাঙালিকে বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না।' ❑

লেখক : মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

৭ই মার্চ

তারিক সুজাত

১.
একটি কণ্ঠে
হাজার বছর জাগে
সাত কোটি প্রাণে
অজেয় আলোর রেখা
খুলে দিলো পথ
মুক্তি ও সংগ্রামের
একটি কণ্ঠে
শিকল ভাঙার গান
বোবা ইতিহাসে
অযুত আঘাতে
শোণিত ওঙ্কার–
'রক্ত যখন দিয়েছি
রক্ত আরো দেবো'
একটি কণ্ঠে
লাঙলের ফলা
পলিমাটির ঘ্রাণ
কাননে কুসুম
দুঃখিনী বর্ণমালা
মসলিন ধোঁয়া
নরম আঙুলে
রক্তজবার ডাক
সেই থেকে আমি
শিখেছি মন্ত্র–
'দাবায়ে রাখতে
পারবা না'

২.
কণ্ঠে তোমার
কবেকার কলরব
শান্ত দুপুরে
মুক্তির হালখাতা!
এসেছিলে যেই পথে
সেপথে ফিরবো আমি
রোদের রুমাল নেড়ে
সেই মার্চে ফিরি
যেখানে আমার দেশ
শোণিত শপথে আঁকে
গাঢ় সবুজের বুকে
রক্তবর্ণ তিল!

লক্ষ কণ্ঠ
তোমার কণ্ঠে জাগে
হাজার বছর ফেরে
চর্যাপদের পথে
কবির কণ্ঠে
জয় বাংলার ধ্বনি
জন্ম নিচ্ছি
উড্ডীন পতাকায়
৭ই মার্চ তুমি
পিতার আঙুল-ছোঁয়া
অমেয় আকাশ
৭ই মার্চ তুমি
আমার জন্মতিথি
আমি বাঙালি,
আমি বাংলাদেশ!